২৬ রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকের রাজা চরিত্র বিচার কর।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের সংঘাত ও নাট্য দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে এক তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব — তা হল প্রাণ ধর্মের সাথে জড় ধর্মের। রক্তকরবী নাটকের রাজাকে সেই জড়ধর্মের প্রতীক করে তোলা হয়েছে। যদিও রাজার মধ্যে প্রাণধর্মের ও সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্র নাটকে জড়ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। রক্তকরবীতে জড়ধর্ম আকর্ষণজীবী যন্ত্রতন্ত্রের রূপ লাভ করেছে। নাট্য সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে আকর্ষণজীবী যন্ত্রতন্ত্রের সাথে কর্ষণজীবী কৃষির সভ্যতার। রাজার চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ এই দুই সত্তাকেই — জড় ও প্রাণ বা আকর্ষণজীবী যন্ত্রতন্ত্র ও কর্ষণজীবী সভ্যতার সত্তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন একই সাথে।

রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনাতেও তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন '...আদি কবির অন্তঃকরণে দ্বন্দ্ব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা মিলেছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই।... আমার সদ্যোজাত নাটকে রাজার বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।'' নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে নিজের সমালোচনা অনেক সময় সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তেমন কোন সন্দেহের কারণ নেই। কারণ রাজার পরিবর্তনে শেষ পর্যন্ত আমরা যেমন তার বিভীষণ রূপমূর্তিটি দেখতে পেলাম তেমনি লক্ষ্য করেছি যে রাবণ থেকে বিভীষণে পরিণতিতে কোন অস্বাভাবিকতা দেখা যায় নি। পরিবর্তনের বীজ তার চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল।

নন্দিনীর সাথে নেপথ্যবাসী রাজার কথা বার্তায় রাজা চরিত্রের একটা হাহাকারের দিক ফুটে ওঠে। সে হাহাকার নিজের প্রতিই, হোক না কেন সে যক্ষপুরীর যন্ত্ররাজের, থাক না কেন তার অপরিমিত ঐশ্বর্যলিপ্সা।

নন্দিনী রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছে যে কেন সে

নিজের রচিত জালের আড়ালে থেকে ছটফট করছে। উত্তরে রাজার যা বলেছে তাতে রাজা চরিত্রের অন্তরতম পরিচয় পাওয়া যায়।
:— বুঝতে পারবে না আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি — তোমার মত একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বেড়েছে, ঐ একটু খানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।" রাজা নিজের ভারে নিজে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে অথচ যে নন্দিনীর মাঝে তার পরিচয় ঘটেছে তার মধ্যে ছিল তার বিপরীত ধর্ম যা রাজা অনুভব করতে পেরেছেন।:— "শক্তির ভার নিজের অগোচরে নিজেকে কেমন করে পিষে ফেলে, সেই কথাটা সেদিন তাই বুঝেছিলুম। আর, তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখেছি যা এর উলটো
নন্দিনীর সাথে পরিচয়ের ফলে এই ভাবে রাজার মধ্যে মানবিক সত্তার জাগরণ ঘটেছে যে তা গুপ্ত অবস্থায় ছিল। এর ফলে নন্দিনীর প্রতি রাজা আকৃষ্ট হয়েছে। তাই নন্দিনীর ভালোবাসার পাত্র রঞ্জনের কথা উঠতেই রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রেমাস্পদকে না পেলে যেমন প্রেম আত্মধ্বংসী হয়ে ওঠে, রাজা নন্দিনীকে না পাওয়ায় রাজার মধ্যে সেই ভাব জাগ্রত হয়ে উঠেছে। একদিকে প্রেমের ব্যাকুলতা, অন্যদিকে প্রেম ধ্বংসীরূপ। একদিকে নন্দিনীকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা অন্যদিকে না পাওয়ার বিষণ্ণতা। এর ফলেই রাজার মধ্যে প্রেম থেকে মৃত্যু কামনা জাগ্রত। কারণ তিনি ভেবেছেন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সেই প্রেমকে পাওয়া যায়।:— 'সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাত দুটো সে দিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন করে ভাবি নি। সেই ঝরঝরে কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জানো না, আমি কত শ্রান্ত।"
রাজার অন্তরে এমনি এক শূন্যতা রাজা চরিত্রে

তার ভক্তের ভয় হবে মূর্তিটিও [illegible]। আহরণজীবী সভ্যতার শিক্ষা ও সংস্কারের বৈশিষ্ট্যই হল হিংস্রতা, প্রাণ তারা হরণ করতে পারে। প্রাণদান করতে পারে না। রাজাও তেমনি সবকিছুকে পঙ্গু করে দিয়েছে, কিশোরকে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে দিয়েছে। রঞ্জনকেও রাজা হত্যা করেছে। কিন্তু কি করতে কি হয়ে গেল, রঞ্জনের মৃত্যুই তাকে পরিবর্তনের শেষ সীমায় পৌঁছে দিল। নন্দিনীর প্রেমের স্পর্শ পরিবর্তনের পথ তৈরি করেছিল — রঞ্জনের মৃত্যুতে রাজার সেই পথ ধরে যাত্রা শুরু হলো। রাজার [illegible] যন্ত্রসত্তার ✗ মৃত্যু ঘটলো রঞ্জনের মৃত্যুতে। আর রঞ্জনের প্রাণচেতনা রাজার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করলো — যা ছিল যন্ত্র তা হয়ে উঠল প্রাণের আধার।

রঞ্জনকে হত্যা করে রাজা এ অনুভব করলেন যে এতো দিন যে তিনি হত্যা করে এসেছেন তা যেন নিজেকেই হত্যার শামিল, নিজের আর নিজেকেই আঘাত করতে লাগল। ~~রাজাকে এভাবে আবেগ আঘাত করতে লাগল ফুল প্রাণের বন্ধন আলগা~~। ইতিপূর্বেই নন্দিনীর প্রেমের স্পর্শে তার চরিত্র পরিবর্তনের পথ খুঁজে পেয়েছিল। রঞ্জনের মৃত্যুতে রাজা নন্দিনীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাঁধা মুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল। — 'এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক — তাতেই আমার মুক্তি।'

রাজা মুক্তি পেলেন ✗ যন্ত্র ~~বিজ্ঞানের~~ বিধি-বিশ্ব থেকে। প্রাণবিশ্ব তার মধ্যে সাড়া দিল। প্রকারান্তরে রাজার এই পরিবর্তনে জয় লাভ ঘটল প্রাণবিশ্ব তথা ~~সব~~ মানবতার, পরাজয় ঘটল যন্ত্রবিশ্বের বা অমানবিক শোষণ প্রবৃত্তির, রাজার পরিবর্তন অবশ্য মনস্তত্ত্ব সঙ্গত পথেই ঘটলো। তাই রাজা চরিত্র যেমন [illegible] জীবন্ত হয়ে তেমনি রাজার এই পরিবর্তন নাটকে মূল বক্তব্যের ও সার্থকতা এনেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নাটকে বর্ণিত সমাজ

যে-কোন শিল্পী ও সাহিত্যিককে সমাজ ও সময়-সচেতন হতেই হয়। সেই চেতনা শিল্পীভেদে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে পরিবেশিত হয়। মনোজ মিত্র ভারতীয় গ্রামসমাজের সামন্ত-সংস্কৃতি লালিত ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ ও সামন্ত-সময়কালের প্রতি তার নিজস্ব মনোভাব তুলে ধরেছেন তাঁর *গল্প হেকিম সাহেব* নাটকে। গ্রামীণ সরলতা-সততা বনাম নাগরিক চতুরতা তাঁর নাটকের অন্যতম বিষয়। *গল্প হেকিম সাহেব* নাটকের ক্ষেত্রেও এক বিশেষ সময়পর্বের সমাজকে প্রেক্ষাপটে রেখে হেকিম ও তার চারপাশের চরিত্রগুলোর মনোলোকের নানা রহস্যকেই প্রকাশ করেছেন, স্বাভাবিক সহজতায়। এজন্য তিনি কোথাও উচ্চকিত নন। মানুষ ও সমাজকে অবলোকন করেছেন জীবনরসিকের দৃষ্টিতে। নির্মল কৌতুক, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ, কখনও মৃদু বিদ্রূপই তাঁর হাতিয়ার। এই রঙ্গময়তা মানবিক চেতনারই এক ব্যাপ্ত রূপ। এরই সমান্তরালে অবস্থান করছে মানবিক বিচ্ছিন্নতা, আত্মপরিচয়ের সংকট ও আশ্রয়ের ব্যাকুলতা। আর এই সব রঙগুলো প্রকাশের জন্য তিনি বারবার দ্বারস্থ হয়েছেন বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও গ্রাম্য মানুষগুলোর অন্দর মহলে। মনোজ মিত্রের বেশিরভাগ নাটকে তাই গ্রাম ও নগরজীবনের দ্বন্দ্ব, এই দুই জীবনের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সংঘাত দরদি কলমে পরিবেশিত। সামাজিক জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তি জীবনের নানাবিধ রহস্য, আলোছায়ার বৈচিত্র্য তুলে ধরতে চান বলেই মনোজ মিত্রর নাটকে ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিশেষ সম্পদ রূপে চিত্রিত হয়। *গল্প হেকিম সাহেব* তাই নিছক গল্প নয়, এক বিশেষ সময়পর্বের বাংলার গ্রামজীবনের ট্র্যাজিক চিত্র।

মনোজ মিত্রর সময় ও সমাজচেতনার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করে মানুষ। এক মানবিক সংবেদনশীলতাই এই চেতনার মৌলিক ভিত। তাই বিশেষ সময়কালের হয়েও তাঁর নাটকের চরিত্রগুলো এবং ভাববস্তু চিরকালীন সত্যের মর্মে পৌঁছে যায় সহজেই। *গল্প হেকিম সাহেব* নাটকে দেখি নাট্যবর্ণিত সময় ও সমাজ নির্দিষ্ট হলেও নিষ্ঠা, সততা, নৈতিকতার মানবিক গুণের কারণে এর বাণী শাশ্বতকালের হয়ে উঠেছে। যেখানেই তিনি গ্রামীণ সমাজের ছবি তুলে এনেছেন, সেখানেই দেখি গ্রাম্য সাদাসিধে মানুষগুলোকে বাতিল করতে চাইছে নাগরিকতা, বাতিল হয়ে যাচ্ছে পুরোনো মূল্যবোধ, কিন্তু এক মমতাময় চিত্রণই সেই পর্যুদস্ত মূল্যবোধকে জিতিয়ে দিচ্ছে। আসলে নাট্যকার ঐতিহ্য সম্পর্কে দারুণ সচেতন, আর সেই ঐতিহ্য সন্ধানের ফসল রূপক-ভাবনা। দেশ-কাল-সমাজের এই বিবর্তন সন্ধান করেছেন তিনি পুরাণ থেকে লোককথায়।

১৯৮৫-তে লেখা একটি নিবন্ধে মনোজ মিত্র বলেছিলেন—"আমি এই মুহূর্তে একটি বিষয়কেই অধিকার দিয়ে লিখতে চাই, সেটা হল দীন মানুষ, দুর্বল মানুষ, অবহেলিত এবং পর্যুদস্ত মানুষ তার হীনতা, তার দুর্বলতা, তার ভয়, দ্বিধা, সংশয় কাটিয়ে মানুষের মতো উঠে দাঁড়াচ্ছে। এদেশের যে কোন ঘটনার মধ্যেই আমি এই মানুষকে খুঁজি, মানুষের এই সংগ্রামকেই ধরতে চাই।" এর প্রায় দশ বছর পরে লেখা *গল্প হেকিম সাহেব* নাটক, সেখানেও দেখি সেই ন্যুব্জ মানুষদের ব্যক্তিবিদ্রোহ, অসম লড়াই, বিশ্বাসের জোর ও স্বপ্ন বিক্রি না করার কথাই স্পষ্টত প্রকাশিত এক বিশেষ সময়কালের প্রেক্ষাপটে। ব্যক্তি সমাজ ও সময়ের ট্র্যাজিক ছবি গল্প

হেকিম সাহেব-এর অন্যতম সম্পদ। হেকিমের ঔষধ আবিষ্কারের সাধনা আর মনোজ মিত্রর দেশজ নাট্যকলার সন্ধান একাকার হয়ে যায় এ-নাটকে। হেকিমের ওষুধকে পুরোনো বলে বাতিল করতে চায় শহুরে চিকিৎসা, লোকজ উপাদানকে বাংলা থিয়েটার থেকে হটিয়ে দিতে চায় শহুরে আঙ্গিক, কিন্তু হেকিমের মতোই নাট্যকার নিজ সংকল্পে অটল, বারবার চলে আসেন মাটির কাছাকাছি। তাই নাটকের শেষে হেকিমের মৃত্যু হলেও তার ফেলে যাওয়া স্বপ্নরাজ্যের বাসিন্দা হয়ে যায় গঙ্গামণি, ছায়েম। এক চিলতে উঠোনে 'রক্তগুলাব' ফোটায় গঙ্গামণি, আর ছায়েম চাঁদনি রাতে বসে থাকে জোছনা ধরার জন্য।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এ-নাটকের পটভূমি। নাটকের মর্মে মর্মে তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে। কেবল সূত্রধার ফকিরের কথনে নয়, চরিত্রগুলোর আচার-আচরণে, নানাবিধ সামাজিক দ্বন্দ্বে। ফকির বলেছে—'মানুষটি শ-দেড়েক বছর পূর্বেকার'। ১৯৯৩-এ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সময়কালকে ধরে দেড়শো বছর পিছিয়ে গেলে আমরা পৌঁছে যাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। নিখুঁত সাল-তারিখ এখানে খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়, প্রাসঙ্গিক বাংলাদেশের ওই সময়ের অস্থির রাজনৈতিক পর্বটি। যখন রাজা ইংরেজ, কিন্তু তার শাসনপ্রণালীর শত শত মুখ। শোষণ অত্যাচারেরও শত শত রূপ। ইংরেজের লুণ্ঠনবাদী আর্থিক নীতির শিকার ঘুণধরা ভারতীয় সমাজ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের বরাত নিয়ে পরিণামে দেশের শাসক হয়ে বসেছে। ভূমিব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায়ের নীতি তখন নির্ধারিত হচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন মোতাবেক। সেকালের জমিদার-জোতদার-শাসিত সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ জীবন এ-নাটকের আধার।

মোগল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীর কোনও স্থান ছিল না। কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বাদ দিলে কার্যত জমির ওপর রাষ্ট্র অথবা জমিদার জাতীয় শ্রেণীর দখলিস্বত্ব মোগল আমলে ছিল না। জমির সত্যিকার মালিক তখন ছিল তারাই যারা নিজেরা গ্রামে কৃষিকার্যের দ্বারা জমিতে ফসল উৎপাদন করতো। কাজেই সে সময় যাদেরকে জমিদার বলা হত তারা ছিল সরকারের রাজস্ব আদায়ের এজেন্টমাত্র, ভূস্বামী অথবা জমির মালিক নয়। অবশ্য মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার দুর্বলতা ও অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে কর-আদায়কারীরা নিজ নিজ এলাকায় ইচ্ছেমতন রাজস্ব আদায় করতে থাকে। এর ফলে কৃষকদের ওপর চারিদিক থেকে নানা প্রকার কর্মচারীদের যে ব্যাপক নির্যাতন শুরু হয়, সেই প্রসঙ্গে ফরাসি পরিব্রাজক বার্নিয়ের আঠারো শতকের শেষে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখেছেন এইসব কর্মচারীরা কৃষকদের ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ক্ষমতা কায়েম রাখতে কেবল কৃষক নয়, নিজ এলাকার অন্তর্গত নগর ও গ্রামের কারিগর ও ব্যবসায়ীদের ওপরও অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা চালাতো।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাটের থেকে দেওয়ানি লাভ করে বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হয়। কোম্পানির এক নির্দেশনামায় বলা হয়, রায়তদের বোঝানো উচিত কর বৃদ্ধি করা কোম্পানির উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য নির্যাতনকারী ও কৃষকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিপীড়নের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করা। কিন্তু ঠিক এর বিপরীত চিত্রই আমরা ঘটতে দেখি। কারণ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল বিদেশী প্রতিষ্ঠান। মুখে যাই বলুক এদেশে মুনাফা লুণ্ঠন করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। উপরন্তু কোম্পানির পরিচালন ব্যবস্থায় এইসময় বহু সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলত, কোম্পানির কর্মচারীরাই

যথেচ্ছভাবে চারিদিকে ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি করতে লুঠতরাজ শুরু করে। এর ফলে কৃষকরা অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই অদৃষ্টপূর্ব সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং তাদের জীবনে নেমে আসে বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ)।

তৎকালীন ইংরেজ শাসকরা এই মহাদুর্ভিক্ষের জন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে দায়ী করলেও প্রকৃতপক্ষে এই দুর্ভিক্ষের সঙ্গে অনাবৃষ্টি অথবা ওই ধরনের কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। ইয়ং হাসব্যান্ড (এই দুর্ভিক্ষের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক) ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি পুস্তকে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকদের ভূমিকা সম্পর্কে লেখেন : "চাষিরা তাহাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমের ফসল অপরের গুদামে মজুত হইতে দেখিয়া চাষবাস সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িল। ইহার ফলে দেখা দিল খাদ্যাভাব। দেশে যাহা কিছু খাদ্য ছিল তাহা ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া দখলে চলিয়া গেল।.....চরম খাদ্যাভাবের এক বিভীষিকাময় ইঙ্গিত লইয়া দেখা দিল ১৭৬৯ খ্রি: সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক, তাহাদের সকল আমলা-গোমস্তা, রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিলো সেখানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান-চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। এই জঘন্যতম ব্যবসায় মুনাফা হইল এত শীঘ্র ও এরূপ বিপুল পরিমাণে যে.....।" ইত্যাদি [Quoted in Memorandum on the Permanent Settlement Presented by the Bengal Provincial Kissan Seva to the Land Revenue Commission / Published by Smiritish Banerjee. উদ্ধৃত হয়েছে—*চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক* বদরুদ্দিন উমর, একক পরিবেশনায়, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৮১, পৃ-১৯-২০]

ইংরেজ বণিকদের ভূমি রাজস্বনীতি কোন্ রাজস্বের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল এবং তা কতটা নির্মমভাবে, তা লাভের অঙ্ক দেখলেই বোঝা যেত। কিন্তু এত করেও কোম্পানি রাজস্ব ব্যবস্থাকে একটা সুষ্ঠু কাঠামোর ওপর দাঁড় করাতে পারেনি। প্রথমদিকে একশালা বন্দোবস্ত চালু করে, ব্যর্থ হবার পর ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে পাঁচশালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে। এই ব্যবস্থাও ব্যর্থ হল। এরপর দশশালা বন্দোবস্ত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে একটা নিশ্চিত ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে ব্যর্থ হলে লর্ড কর্নওয়ালিশ নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। নতুন প্রস্তাব ১৭৯৩-তে কোম্পানির দ্বারা অনুমোদিত হয়। এটিই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, জনসমাজে এটি সূর্যাস্ত আইন নামেও পরিচিত ছিল।

পূর্ববর্তী ব্যবস্থা অনুযায়ী জমিদাররা ছিল কোম্পানির রাজস্ব-আদায়কারী এজেন্ট। জমিতে তাদের দখলিস্বত্ব ছিল না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাদেরকে জমির মালিক বা স্বত্বাধিকারীরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হল। নতুন আইনে স্থির হয় জমিদাররা আদায়কৃত রাজস্বের নয়-দশমাংশ কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করবে। এই হিসেবমতো একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক জমিদারদের দেয় রূপে নির্দিষ্ট থাকে। বছরের নির্ধারিত সময়ে সূর্যাস্তের পূর্বে নির্দিষ্ট রাজস্ব কোম্পানির ঘরে জমা না দিলে জমিদারি নিলাম হয়ে যেত। নির্দিষ্ট সময়ে ধার্য রাজস্ব কোম্পানির ঘরে জমা পড়লে বংশানুক্রমে জমিদাররা জমির স্বত্বাধিকারী হতেন। জমির মূল্য ভবিষ্যতে যাই-ই হোক তাতে কোম্পানির বন্দোবস্তের কোনও পরিবর্তন হতো না। এই বন্দোবস্ত অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী।

এর ফলে এদেশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সূচিত হল। পূর্বে যে জমির মালিক ছিল কৃষক, সেই জমির মালিক হল পূর্বের রাজস্ব আদায়কারী এজেন্ট জমিদার। জমির

মালিকানার হস্তান্তরের ফলে জমিদাররা ইচ্ছেমতভাবে জমি ক্রয়-বিক্রয়, বিলি-ব্যবস্থা সবকিছু করারই অধিকার লাভ করলো।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে কোম্পানি এদেশে কোন জমি জরিপ করেনি। কাজেই যে সমস্ত জমি তখনও পর্যন্ত অনাবাদি ছিল সেগুলো পর্যন্ত জমিদারের দখলীভুক্ত হল এবং এর ফলে আবাদযোগ্য জমির পাশাপাশি সমৃদ্ধ বনাঞ্চলেরও মালিক হল জমিদারেরা। আবার, কোম্পানি এর ফলে জমির দাবি চিরকালের মতো ছেড়ে দিলেও জমি থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের মুনাফা অর্জনে নিশ্চিত হল। একদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অংশীদারদের ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশের দাবি এবং অন্যদিকে যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোম্পানির অর্থের প্রয়োজন—এই দুই দাবি মেটানোর ক্ষেত্রে কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেকাংশেই কার্যকরী হয়। আর্থিক প্রয়োজন ও ভূমিরাজস্বব্যবস্থাকে একটা নিশ্চিত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গে এর পেছনে কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল।

জমিদারদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে লর্ড কর্নওয়ালিশ বলেন—"আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই (এদেশের) ভূস্বামীগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে।" (*Land Problems in India*, Radha Kamal Mukherjee, P-35) গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের মোকাবিলা করার জন্য জমিদারদের ভূমিকা বিষয়ে উইলিয়াম বেন্টিক ১৮২৯-এ ঘোষণা করেন—"আমি এটা বলতে বাধ্য যে, ব্যাপক গণবিক্ষোভ অথবা গণবিপ্লব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে।" (*India Today*: Rajani Palm Dutt : P- 218) সে এর ফলে যে বিপুল সংখ্যক ধনী ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় তারাই ব্রিটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখতে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছিল।

উনিশ শতকের ভারতীয়ত্বের অন্যতম প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের নিদারুণ বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে মাঝে মাঝে লেখনী চালনা করলেও ইংরেজসৃষ্ট সামন্ত স্বার্থের বাহক ধারক ও সেবক হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে নিজ মনোভাব প্রকাশ করেন—"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি।" [বঙ্গদেশের কৃষক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; *বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড)* সাহিত্য সংসদ পৃ-২৯৮]

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশে জমিদার শ্রেণী শেষদিন পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসকদের সমর্থন করা থেকে বিরত থাকেনি। কাজেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলেও তা যে সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সমাজ ছিলো বিশৃঙ্খল। জমিদারদের বেশিরভাগই বাস করতো শহরে, নায়েব গোমস্তাদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে তা দুহাতে খরচ করতো। জমি থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের এক কানাকড়িও জমির উন্নতি বা কৃষকদের জন্য ব্যয়িত হত না। উপরন্তু জমিদার আইন মোতাবেক নির্দিষ্ট কর আদায় করেই ক্ষান্ত হত না, নিত্যনতুন কর ধার্য ও পাওনার দাবি নিয়ে উপস্থিত হত। এইজাতীয় সম্পূর্ণ বেআইনি পাওনা মেটাতে গিয়ে কৃষকরা উত্তরোত্তর গরিব ও নিঃস্ব হয়ে পড়তো। দুতরফা শোষণের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করবার কোনও বন্দোবস্ত ইংরেজ সরকার নেয়নি। কৃষকদের ওপর জমিদারদের অত্যাচারের মাত্রা ক্ষেত্রবিশেষে এমন চরম আকার নিত যে প্রজাবিদ্রোহের ঘটনাও ঘটতো। কারণ ১৭৯৩-এর

আইনে জমিদারদের ভূমধ্যকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েই সরকার ক্ষান্ত হয়নি, এর পরবর্তী পর্যায়ে ইচ্ছেমতো কর ধার্যের অধিকার দিয়ে জমিদারদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অত্যাচারের পথ খুলে দেয়। অন্যদিকে সূর্যাস্তের পূর্বে নির্দিষ্ট কর কোম্পানিকে দিতে না পারলে নিলামকৃত জমিতে নতুন জমিদারকে ইচ্ছেমতো অতিরিক্ত কর বৃদ্ধির অনুমতিও এই আইনে দেওয়া হয়েছিল। ফলত সার্বিক দুর্গতি ঘটতো সাধারণ প্রজাদেরই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ছাড়াও ধাপে ধাপে আরও অনেক ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর জন্ম হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে এদেশে নিয়মিত খাদ্যসঙ্কট, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী লেগেই থাকত, একই সঙ্গে কৃষকরা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হতে থাকে। এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টির অন্যতম কারণ ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অসংখ্য জমিদারির হাতবদল। জমিদাররা হাতবদলের সুযোগ নিয়ে নিলামে ওঠা জমিদারি কিনে নিত মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, মহাজন এবং ব্যবসায়ীরা, ফলে পত্তনিদার নামে এক নতুন বংশানুক্রমিক মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা'য় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার ওপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের কৃষকদের অবস্থা এবং জমিদার, পত্তনিদার ও সরকারি কর্মচারীদের উৎপীড়নের মাত্রা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই রচনাগুলোতে—"তিনি (জমিদার) নায্য রাজস্ব ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ী রাজস্বে নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনি, পার্বণি, হিসাবা না প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিপীড়ন করিতে থাকেন।.....ভূস্বামীদের ভবনে বিবাহ, আদ্যকৃত, দেবোৎসব বা প্রকারান্তর পূণ্যক্রিয়া ও উৎসব ব্যাপার উপস্থিত হইলে প্রজাদের অনর্থপাত উপস্থিত;তাহাদিগকেই ইহার সমুদায় বা অধিকাংশ ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়। ইহা মাঙ্গন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ; পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন ; বৈশাখ, ১৭৭২ শক, ৮১ সংখ্যা। উদ্ধৃত হয়েছে *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* [২য় খন্ড] বিনয় ঘোষ, পৃ-১০৯-১০) অন্য একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে—"তাহাদের প্রজাদের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, তাহারিদিগের শরীরও আপনার (জমিদারের) অধিকারভুক্ত জ্ঞান করেন এবং তদনুসারে তাহাদিগের কায়িক পরিশ্রমও আপনার ক্রীত বস্তু বোধ করিয়া তাহার উপর দাওয়া করেন।.....ক্রীতদাসকেও এরূপ দাসত্ব করিতে হয় না।" [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা/১৭৭২ শক, ৮৪ সংখ্যা, উদ্ধৃত বিনয় ঘোষ পৃ-১৩৯]

কৃষক ও প্রজাসাধারণের ওপর নির্যাতন শুধুমাত্র জমিদারি ও ইজারাদারি প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের নির্যাতনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রামাঞ্চলে প্রায় নৈরাজ্যের অবস্থার মধ্যে সরকারি কর্মচারীরা সাধারণ কৃষক ও বিভিন্ন ধরনের গ্রাম্য কারিগরদের ওপর যে উৎপীড়ন ও শোষণ করতো 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তারও নিদারুণ চিত্র পাওয়া যায়—"দুঃখের আর অন্ত নাই, প্রজাপীড়নের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহার এক অঙ্গের নাম ফৌজদারী উপদ্রব।.....পঞ্চম বর্ষীয় বালকও থানা ও দারোগার নাম শুনিয়া সভয়ে মাতৃক্রোড়ে গিয়া নিলীন হয়।..... চৌর্য, দস্যুবৃত্তি তদনুরূপ কোন ব্যাপারের অনুসন্ধান পাইলে তিনি স্বসম্প্রদায় সমভিব্যাহারে গ্রাম মধ্যে সমাগমপূর্বক অশেষ প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করেন।" (তত্ত্ববোধিনী, ৮১ সংখ্যা, উদ্ধৃত বিনয় ঘোষের বই পৃ-১১৪-১১৫)

জমিদার, ইজারাদার, পত্তনিদার প্রভৃতি রং-বেরং-এর মধ্যস্বত্বভোগী শোষকরা কৃষকদের ওপর যত প্রকার নির্যাতন চালাতো তার তালিকাও পত্রিকায় উল্লেখিত হয়—দন্ডাঘাত, বেত্রাঘাত, চর্মপাদুকাপ্রহার, বাঁশ ও কাঠ দিয়ে বক্ষস্থল দলন, মাটিতে নাসিকা ঘর্ষণ, গায়ে বিচুটি দেওয়া ইত্যাদি। [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৮৪ সংখ্যা, বিনয় ঘোষের বইতে উদ্ধৃত পৃ-৩৯, ১২৩]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-প্রভাবিত সমাজ *গল্প হেকিম সাহেব* নাটকের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে। ফকিরের প্রথম কথনে এই আইন ও সেই সমাজের বিস্তৃত পরিচয় উঠে এসেছে—নাটকে দরিয়াগঞ্জ ও পলাশপুরের ওয়ালি খাঁ বা পশুপতি পোদ্দার জমিদারের অধীনস্থ পত্তনিদার। নগরায়ণের চাপে তখনও ক্লিষ্ট নয় দরিয়াগঞ্জ বা পলাশপুরের মতো গ্রাম। গ্রামীণ স্বাস্থ্যরক্ষার কোন দায় এইসব মধ্যস্বত্বভোগীরা নিত না। গ্রামে ছিল না কোন বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা। হেকিম-বদ্যিদের হাতেই ছিল গ্রামের স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার। অশিক্ষা, কুসংস্কার, আচার-বিচারের চাপে পঙ্গু সেই পল্লীসমাজে রোগ বালাই লেগেই থাকত। "ম্যালেরিয়া কালাজ্বর পিলেজ্বর হাঁপ যক্ষা খোসপাঁচড়া হাঁস-মুরগির মতো পোষা ছিল গেরস্তের ঘরে ঘরে।" না ছিল সুরক্ষিত পানীয় জল, না ছিল নিকাশী পয়ঃপ্রণালী। মাঠঘাট রাস্তা ছিল খানাখন্দময়, জঞ্জালময়। কিন্তু দেশের রাজা থেকে অঞ্চলপ্রধান বা জমিদার—জোতদার কারুরই সেদিকে মন দেবার মতো সময় ছিল না। তারা ব্যস্ত পাইক বরকন্দাজ ঘোড়া হাতিসহ বাইজিবিলাসের ফূর্তিতে। প্রজাদের ওপর চলতো নির্মম শোষণ, নিপীড়নের কোনও সীমা ছিল না। কারণ, জমিদারের বিলাসের ব্যয় যেমন কৃষক রায়তদের কাছ থেকেই আদায় করা হতো, তেমনি ইংরেজ শাসকের রাজস্বও আসত সেই কৃষকদের কাছ থেকেই। আর মাঝখানে ছিল হাজারো মধ্যস্বত্বভোগী-তহশিলদার আর নায়েব-গোমস্তার উদরপূর্তির আবদার। ফকিরের কথায়—"দেশের রাজা ইংরাজ, ইংরাজের চেলা জমিদার, জমিদারের তল্পিবাহক তালুকদার, তহশীলদার, পত্তনিদার—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নানান মধ্যস্বত্বভোগী.....বুঝত কেবল খাজনা। মানুষ মরছে মরুক, খাজনা চাই।"

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটির শুরুতে নাট্যকার ফকিরের মুখ দিয়ে সেকালের সমাজের এক ঝলক পরিচয় তুলে ধরেছেন। "দরিয়াগঞ্জ আর পলাশপুর .... নদীর দুই তীরে দুই তালুক। এপারে রাজত্ব করেন খান বাহাদুর ওয়ালি খাঁ সাহেব, ওপারে শ্রীযুক্ত পশুপতি পোদ্দার। দুপারেই ছিল বাপ মস্ত দুই আস্তাবল.....আর তাজী ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি.....আর লেঠেল পাইক বরকন্দাজের হাঁকাহাঁকি। লেগেই ছিল দুপক্ষের লাঠালাঠি ঠোকাঠুকি। তা এরই মধ্যে দরিয়াগঞ্জের খাঁ সাহেব ছিনিয়ে নিলেন পলাশপুরের বাঈজী....." চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপজাত ফসল এইসব জমিদার-জোতদারদের মধ্যে হাস্যকর প্রতিযোগিতা লেগেই থাকতো। নাটকে ওয়ালি খাঁ ও পশুপতি পোদ্দারের প্রতিযোগিতার কিছু কৌতুককর ছবি নাট্যকার উপস্থিত করেছেন সরস ভঙ্গিমায়। পলাশপুরের বাইজি মোহরকে মাঝপথে লুঠ করে নিয়েছে ওয়ালি খাঁ। তারপর সাগ্রহ নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে পশুপতির কাছে। নাট্যকাহিনি থেকে আমরা জেনেছি, এই মোহরবাঈ আসলে পলাশপুরের চর। তাকে যাতে ওয়ালি ছিনতাই করেন তারই বন্দোবস্ত পাকা করেছে পশুপতি। কারণ সবদিক থেকে সে ওয়ালির তুলনায় এগিয়ে থাকলেও একজায়গায় সে পিছিয়ে পড়েছে—গ্রামীণ স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিব্যবস্থায়। ওয়ালির তালুকে আছে হেকিমের মতো মানুষ, কিন্তু পশুপতির এলাকায় কোনও ভাল বদ্যি নেই। বাইকে ছিনতাই করার পর ওয়ালি হাহুতাশ করেছে পলাশপুর দরিয়াগঞ্জের মধ্যে লড়াই বাধছে না বলে।

পশুপতি একশো লেঠেল পুষেছে বলে ওয়ালি পুষেছে একশো বারো। পশুপতির ডাকাত পঞ্চাশ, তাই ওয়ালি রেখেছেন পঞ্চান্ন ডাকাত। পশুপতির বিয়ে তিনটে, তাই ওয়ালি শাদি করেছেন চারটে। পশুপতির ছোট বউটি ভারী কচি শুনে ওয়ালি বলেন তার ছোট বিবির বয়স এতই কচি যে বলার অপেক্ষা রাখে না, তার বাপের বয়সই পঁয়ত্রিশ। এর উত্তরে পশুপতি ওপার থেকে আগত ওয়ালির প্রতিনিধি হর্তুকিকে বলেছে—"কনের বয়স দেখে ইতিমধ্যে তিনটি বিবাহ সেরেছি, বাকি কয়েকটি না হয় কনের বাপের বয়স দেখেই সারা যাবে।.....আসলে আপনারা আমায় দাবিয়ে রেখেছেন একটাই জায়গায়.....কেবল একটাই.....আন্দাজ করতে পারেন, কী সেটা? জনস্বাস্থ্য....পাবলিক হেলথ। গেল বছর আমার তালুকে সামান্য আমাশায় মারা গেছে শ'য়ের ওপর।" (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য) তাই মোহরকে সে কৌশল করে পাঠিয়েছে দরিয়াগঞ্জে। বাই দরিয়াগঞ্জে গিয়ে গোলাপবাগান অবরোধ করবেন, নিজের পোষা বিড়ালের মৃত্যু ঘটাবেন, দায় চাপাবেন হেকিমের ওপর যাতে ওয়ালির হাতে মার খান তিনি এবং মার খেয়ে খেয়ে হেকিম পলাশপুরে পালাতে বাধ্য হন। এইসব অপদার্থ তালুকদাররা নিজেদের কর্তব্যের প্রতি ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। গ্রামের মানুষ দারিদ্র্যক্লিষ্ট, অর্ধাহারে অনাহারে বেঁচে থাকে। গাঁ-গঞ্জ অসুখবিসুখের খোঁয়াড়, কিন্তু তালুকদারেরা ব্যস্ত বাইজিবিলাসে। বাইয়ের পোষা বিড়ালের মৃত্যুতে জমিদার ও তার তল্পিবাহকরা কেঁদে ভাসিয়েছে, এমনকি এর জন্য হেকিমকে জুতো পেটাও খেতে হয়েছে, কিন্তু এক মহান ঔষধ আবিষ্কারের জন্য হেকিম পায়নি একটি অনিবার্য উপকরণ 'রক্তগুলাব'। অথচ ওয়ালির মস্ত রক্তগোলাপের বাগিচা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়েছে মোহরবাঈয়ের আবদার মেটানোর জন্য।

এইসব বুদ্ধিহীন হৃদয়হীন তালুকদারদের যে ব্যক্তিত্ব বলতে কিছুই নেই তার পরিচয়ও আছে নাটকে। ওয়ালিকে চারপাশের তল্পিবাহকরা যখন যেমনভাবে পরিচালিত করে সেভাবেই চলেন তিনি। একবার নায়েবের কথামতো, তো পরের মুহূর্তে মোসাহেবের পরামর্শমতো মাথা নাড়েন। মৌলবি এসে সুপরামর্শ দেন, তার কথার সারসত্য বুঝলেও শেষ পর্যন্ত মৌলবির প্রতিও সুবিচার করতে পারেন না। তবু ওয়ালির যাবতীয় অপদার্থতা অনেকখানিই ঢেকে রেখেছে হেকিম। গাঁ-গঞ্জের রাস্তাঘাট সারানো পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার ইত্যাদি তাঁরই কাজ। কিন্তু তিনি তা করেন না বলেই এত অসুখবিসুখ; হেকিমের প্রতি ওয়ালির তাই কিঞ্চিৎ পক্ষপাত আছে। হেকিম দাওয়াই দিয়ে রোগবালাই না সারালে তার খাজনা আদায়ই বন্ধ হয়ে যাবে।

হর্তুকি॥ সামনে চোত-কিস্তি। তাড়াতাড়ি সুস্থ করে না তুলতে পারলে, ওই জ্বরজ্বারির ছুতোয় ব্যাটারা যে খাজনা মুকুব করতে বলবে, সে খেয়াল আছে?

ওয়ালি॥ না না তাড়াতাড়ি সারাও সেটা। কাজে মন দাও। দ্যাখো আমার তালুকের সাতখানি গাঁয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি....এখন তোমার তো উচিৎ আমার যাতে খাজনা মার না যায়, অন্তত সেইমতো স্বাস্থ্যরক্ষা করে যাওয়া....।

[প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

মৌলবি একসময় ওয়ালিকে সচেতন করাতে চেয়েছেন জমিদারের কর্তব্য বিষয়ে, গ্রামের রোগবালাই তো তিনিই সারাতে পারেন—"রাস্তাঘাটের ময়লা সাফা, নিয়মিত গরু ছাগলের খোঁয়াড় সাফা, মশামাছি মারা, মানুষের জন্য দুবেলা পেটটি ভরে খাওয়া, আর পানির পৃথক ব্যবস্থা.....এই করলেই অর্ধেক রোগ সাবাড়।" (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য) এসব শুনে ওয়ালি

স্বীকার করেছেন জমিদারবাবুর কাছ থেকে তালুক যখন পত্তনি নিয়েছেন তখন সব দায় তার ঠিকই। হর্তুকি ও ওয়ালির সংলাপে বিষয়টি উঠে এসেছে : তবে দায় স্বীকার করে দায় এড়াবার রাস্তাটিও তাঁর আয়ত্তে। তিনি জানান হেকিমকে রেখেছেন এই জন্যই, হেকিম রোগ সারাবে, যথাসময়ে যাতে প্রজারা খাজনা দিতে পারে। অর্থাৎ প্রজা কল্যাণের জন্যে নয়—প্রজারা যাতে খাজনা দিতে পারে তা নিশ্চিত করতেই হেকিমকে রাখা। রাস্তাঘাট করা, পয়ঃপ্রণালী করা, আবর্জনা সাফা করা, খাবার পানির ব্যবস্থা করার জন্য অর্থ খরচ হবে। কিন্তু এইসব তালুকদারদের সেই দায় বইবার মতো মানসিকতা ছিল না! জমিদারি বলতে তারা বুঝতো কেবল অর্থ-আদায়। প্রজা শোষণের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে জমিদারি টিকিয়ে রাখা, আর ফূর্তি করা।

অবশ্য পশুপতি ওয়ালির মতো এতটা বুদ্ধিহীন নয়। তার তালুকেও একইরকম দুর্গতির ছবি। গোমস্তার সঙ্গে তার কথোপকথন থেকে আমরা জানতে পারি, তালুকের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করায় পলাশপুরে স্বাস্থ্যবিধি একেবারেই ভেঙে পড়েছে। পশুপতি বলেছে—"জমিদারের ঘরে আমি ব্ল্যাকলিস্টেড!...তালুকদারী নেওয়ার সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এদিকটা দেখিনি। ইংরেজ বাহাদুর জমিদারদের বলবেন, প্রজাদের স্বাস্থ্যশিক্ষা রাস্তাঘাট আইনশৃঙ্খলা সব তোমরা দ্যাখো, আমায় শুধু অমুক দিন খাজনাটা মিটিয়ে যাও...জমিদারও সঙ্গে সঙ্গে সব দায়িত্ব তালুকদারের ঘাড়ে চাপিয়ে বলবেন, অমুক দিন সূর্যাস্তের আগে আমার খাজনাটি পাঠাও!... বহু চেষ্টা করেও তালুকে একঘর ডাক্তার বসাতে পারলাম না ঠাকুরমশাই...!" [প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

হেকিমকে নিয়েই দুই তালুকে বেঁধেছে প্রতিযোগিতার উল্লাস। কিন্তু হেকিমের দারিদ্র্য কমানোর চেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যায় নি ওষুধের আবিষ্কার মুলতুবি থেকেছে। সেসব দিকে নজর দেয়নি কেউই। হেকিমের অন্নসংস্থান হয় বাড়ি বাড়ি দাওয়াই দেবার পরিবর্তে সংগৃহীত চাল ডাল কলায়। সেই সংগ্রহের দ্বারা হেকিমের উদরই পূর্ণ হয় না, উপরন্তু তার সঙ্গে রয়েছে এক বুড়ো গাধা, ওষুধ তৈরির সাহায্যকারী গঙ্গামণি, ও চালচুলোহীন ভিখারি ছায়েম। সাধারণ প্রজাদের অশেষ দুর্ভোগ, জমিদারদের বিলাসের বিরাম নেই। কিন্তু জমিদার বাড়ির উচ্ছিষ্ট খেয়ে পরমানন্দে ভাঙা তালপাতার পাখার হাওয়া খায় ছায়েম। দারিদ্র্য তার স্বপ্ন কেড়ে নিতে পারেনি।

গঙ্গামণির বর ভন্ডুলই ওয়ালির চর, রাষ্ট্রের ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী। এক তালুকের মালিক অপর তালুকে লেঠেল লাগিয়ে দিত তছনছ করে দিতে। দরিয়াগঞ্জের ওয়ালি ঠ্যাঙাড়ে ভন্ডুলকে কাজে লাগায় পলাশপুরে ডাকাতি করতে। নির্মম শোষণের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয় দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। ওয়ালির রক্তচক্ষু শাসন বর্ষিত হেকিম যেন কিছুতেই ওপারে চলে যেতে না পারে। ভন্ডুলের ছলকথায় হেকিম যখন প্রায় সম্মত পলাশপুরে চলে যেতে, তখনই জানা যায়, ভন্ডুলকে ওয়ালি কাজে লাগিয়েছিলেন হেকিমের মন বুঝতে। ভন্ডুলের লাঠির আঘাতে বুড়ো গাধা মোতির পা জখম হয়। হেকিমের কুঁড়েঘর ধূলোয় মিশে যায় ওয়ালির আদেশে। শেষদৃশ্যে জানা যায়, ভন্ডুলের ধূর্তামিতে ক্রুদ্ধ গঙ্গামণি তারই ফাবড়া দিয়ে হত্যা করেছে স্বামীকে। কিন্তু ডাকাত মারার পুরষ্কার পকেটস্থ করেছেন স্বয়ং ওয়ালি। হেকিম তাই শেষ আঘাতটি আর সহ্য করতে পারেননি, তার খেদোক্তি 'যে পোষে ঠ্যাঙ্গাড়ে, সেই নেয় ঠ্যাঙ্গাড়ে মারার পুরষ্কার'—ধূলোয় লুটিয়ে পড়েন হেকিম।

জোতদারদের এই রকম অত্যাচারে প্রজাবিদ্রোহও ঘটতো, সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে। পশুপতি ও তল্পিবাহক যুগী হেকিমকে শাসিয়েছে পলাশপুরে বিদ্রোহ ছড়ানোর জন্যে। পশুপতি, হেকিম ও যুগীর সংলাপে প্রজা বিদ্রোহের বিষয়টি উঠে আসে :

পশুপতি॥ ভারী সর্দার হয়েছ দেখছি! ঝিকরগাছির লোকদের কী বলেছ তুমি?

হেকিম॥ ঝিকরগাছি...ও হ্যাঁ, কহেছি দীঘি কাটাও!

যুগী॥ তুমি ওদের খাজনা বন্ধ করতে বলোনি?

হেকিম॥ জী হ্যাঁ। খাজনাও দিবে, দীঘিও কাটাবে...দুটি তারা পারে কি করে? আর খাবার পানির ব্যবস্থা করা তো তালুকদারেরই কাজ—[দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য]

—ফলত হেকিম আবারও লাথি খান। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হেকিম দরিয়াগঞ্জে চলে আসেন। ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন তার কুঁড়েঘর ওয়ালি খাঁ। কিন্তু হেকিম স্বচক্ষে দেখেন যে কালব্যাধির ওষুধ আবিষ্কার বন্ধ রাখতে বলেছিলেন ওয়ালি, তা এবার বাসা বেঁধেছে স্বয়ং ওয়ালি খাঁর শরীরে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার গ্রাম সমাজের মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছিল, কৃষকপ্রজা, সাধারণ মানুষ এক অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে তাদের জীবননির্বাহ করতো। নাট্যকার সেই সমাজের বিশ্বস্ত চিত্র উপস্থাপিত করেছেন *গল্প হেকিম সাহেব* নাটকে।